মূল্যবোধ, মনোভাব ও কর্মসন্তুষ্টি
Values, Attitudes and Job Satisfaction

৪

মূল্যবোধ, মনোভাব ও কর্মসন্তুষ্টি - এ তিনটি উপাদান কর্মীর কর্মসম্পাদনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিটি মানুষের কিছু মানবীয় মূল্যবোধ রয়েছে। তাই ইচ্ছা করলেই তাকে দিয়ে যে কোনো কাজ সমাধা করা যায় না। মানুষের মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে মানব সম্পদের সাথে প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য উপাদানের মধ্যকার পার্থক্য বিবেচনায় রেখেই প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অন্যদিকে, মনোভাব এক ধরনের অদৃশ্য শক্তি বা মানসিক প্রবণতা যা মানুষের আচরণ বিশ্লেষণে সহায়ক। অনুভূতি, অবগতি এবং আচরণ প্রবণতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বিষয়, ঘটনা, ব্যক্তি বা গোষ্ঠি সম্পর্কে আমাদের মনোভাব গঠিত হয়। মনোভাব শিক্ষালব্ধ একটি জটিল প্রক্রিয়া বিধায় এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একটি সংগঠনে কর্মরত জনগোষ্ঠীর কর্মসন্তুষ্টির স্তর যেমন উচ্চমাত্রায় হতে পারে তেমনি এ স্তর নিচের দিকে ধাবিত হতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কর্মকান্ডকে নিরবিচ্ছিন্ন ও গতিশীল রাখার জন্য কর্মসন্তুষ্টির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আসুন, এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে জেনে নিই।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: মূল্যবোধ
পাঠ - ২: মনোভাব
পাঠ - ৩: কর্মসন্তুষ্টি

পাঠ ৪.১ মূল্যবোধ
Values

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- মূল্যবোধের গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- মূল্যবোধের উৎসগুলো বলতে পারবেন।
- মূল্যবোধের ধরণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন কতিপয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য বা মানবিক গুণাবলী যা তার আচরণের মান বা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। মূল্যবোধ কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস। এটা মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ডও বটে। মানুষের বোধশক্তি জন্মানোর পর থেকেই তার নিজের মধ্যে বস্তু, ঘটনা ও প্রতিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ধারণা পোষণ করে থাকে। এ সকল ধারনাই ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে তার কাজের নৈতিক আচরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তি জীবন ও কর্মজীবন, দুই ক্ষেত্রেই ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে চায়না।

মূল্যবোধের গুরুত্ব
Importance of Values

সাংগঠনিক আচরণ অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মূল্যবোধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা মনোভাব ও প্রেষণা বোঝার ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি স্থাপন করে এবং আমাদের প্রত্যক্ষণকে সরাসরি প্রভাবিত করে। একজন ব্যক্তি কোন প্রতিষ্ঠানে তার কর্মজীবন শুরুর সময় কি তার "কর্তব্য" এবং কি "কর্তব্য না" এর পূর্বকল্পিত ধারণা নিয়ে প্রবেশ করে। অবশ্যই এ ধারনাগুলো মূল্যবোধবিহীন নয়। শুধু তাই নয়, "সঠিক" এবং কি "সঠিক নয়" এ সম্পর্কেও তারা তাদের নিজস্ব ধারণা বহন করে। মূল্যবোধ মানুষের মনোভাব ও আচরণকে প্রভাবিত করে, ঠিক তেমনি এটা ব্যক্তির মানসিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। ধরুন, একটি প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে যোগদানের সময় আপনার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান করা সঠিক, পক্ষান্তরে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পারিশ্রমিক প্রদান সঠিক নয়। আপনার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে যদি আপনি চাকুরিতে যোগদানের পর দেখতে পান, প্রতিষ্ঠানটি পারিতোষিক দেয় জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে কর্মসম্পাদনের ভিত্তিতে নয়? খুব সম্ভবত আপনি হতাশ হবেন- যা আপনার কার্য অসন্তুষ্ঠির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখবে। আপনার মনোভাব এবং আচরণে কি ভিন্নতা আসবে যদি প্রতিষ্ঠানের বেতননীতির সাথে আপনার মূল্যবোধের মিল থাকে? খুব সম্ভবত আপনার মনোভাব এবং আচরণ ভিন্ন হবে।

মূল্যবোধের উৎস
Sources of Values

মূল্যবোধের একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ জেনেটিক্যালি নির্ধারিত হয়। আপনার মূল্যবোধ কি হবে তার ব্যাখ্যা প্রদানে আপনার পিতা-মাতার ভূমিকা অনস্বীকার্য। তথাপি মূল্যবোধের বৈচিত্রতার ক্ষেত্রে পরিবেশগত উপাদান ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যবোধকে একটি প্রত্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ প্রত্যয়ের উপাদান হচ্ছেঃ নীতি, মান ও বিশ্বাস। এসব উপাদান স্পষ্ট করে দেয় ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানের অবস্থান; ভাল-মন্দ, দোষ-গুন, ন্যায়পরায়নতা, নৈতিকতা বিচার করে এবং নৈতিক অগ্রধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে কাজের দিক নির্দেশনা। এ উপাদানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ বংশগতি থেকে পেয়ে থাকে।

সামাজিক আচরণের দিক দিয়ে কাম্য মূল্যবোধ হচ্ছে সুনাগরিকতা, দলগত বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম ইত্যাদি। সামাজিক বিভিন্ন আচরণের উপর ভিত্তি করে নানা স্তরের মূল্যবোধ তৈরি হয়। সমাজতত্ত্ব ও শিক্ষাতত্ত্বের মধ্য দিয়েও ব্যক্তির মূল্যবোধ প্রভাবিত হয়ে থাকে। পরিবারের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সমাজ অনুমোদিত মূল্যবোধ আহরণ ও আয়ত্ত করতে সহায়তা করে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মূল্যবোধ গড়ে ওঠার পেছনে যেসব সহায়ক কাজ করে তা হলো- পরিবার, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-কানুন, সংবিধান, সংস্কৃতি, নীতিবোধের চর্চা, সংগঠন ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সভা-সমিতি, সামাজিক ন্যায়-বিচার, আইনের শাসন, সামাজিক অনুষ্ঠান, নাগরিক চেতনা, সামাজিক শিক্ষা ইত্যাদি।

মূল্যবোধের ধরণ

Types of Values

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী মিল্টন রকিচ (Milton Rokeach) এর মতে দুই ধরণের মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। একটি হচ্ছে টার্মিনাল মূল্যবোধ (Terminal Values) এবং অপরটি ইন্সট্রুমেন্টাল মূল্যবোধ (Instrumental Values)। মানুষ তার সমগ্র জীবনে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে যে মূল্যবোধ তৈরি করে তাকে টার্মিনাল মূল্যবোধ বলে। অপরদিকে, টার্মিনাল মূল্যবোধ অর্জনে মানুষ যে আচরণ করে ও তার মধ্যে যে মূল্যবোধের জন্ম নেয় তাকে ইন্সট্রুমেন্টাল মূল্যবোধ বলে।

এছাড়া, সামাজিক জীব হিসেবে সাধারণভাবে সমাজ জীবনে মানুষ চার ধরণের মূল্যবোধের মুখোমুখি হয়। যথা- ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

১. **ব্যক্তিগত মূল্যবোধঃ** আধুনিক বিশ্ব সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয় ব্যক্তিগত মূল্যবোধের ওপর। এটি ব্যক্তির স্বাধীনতাকে লালন করে। ব্যক্তিগত মূল্যবোধ হচ্ছে ব্যক্তির আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রেণে তার নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ, যা ব্যক্তির রুচি, বিশ্বাস, মনোভাব, ধারণা ও নীতি-নৈতিকতা থেকে সৃষ্টি হয়। প্রতিটি শিশুই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ নিয়ে জন্মায় এবং পরিবার থেকেই সে তার মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। ব্যক্তির ব্যক্তিজীবন তার মূল্যবোধ দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

২. **সামাজিক মূল্যবোধঃ** যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার-আচারণ ও কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ। সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই.মেরিল (Francises E. Meril) এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হল মানুষের দলীয় কল্যাণের জন্য আচরণ সংরক্ষণ করা, যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।" ন্যায়পরায়নতা, সততা ও শিষ্টাচার সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বড়দের সম্মান করা, সহনশীলতা, দানশীল হওয়া, আতিথেয়তা ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ।

৩. **ধর্মীয় মূল্যবোধঃ** ধর্মীয় ঐতিহ্য ও বিশ্বাস থেকে যে মূল্যবোধ গড়ে ওঠে তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ। ধর্মীয় অনুশীলন এবং নির্দেশনায় গড়ে ওঠা সামগ্রিক বিশ্বাস, আদর্শ, সমাজ ও মানুষের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, দর্শন, রীতি-নীতি ইত্যাদি মিলিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ তৈরি হয়।

৪. **পেশাগত মূল্যবোধঃ** পেশাগত মূল্যবোধ হলো, ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি। ব্যক্তিত্বের ধরণ, আগ্রহ ও কাজ-সম্পর্কিত মূল্যবোধ প্রভৃতি একজন ব্যক্তির পেশাগত মূল্যবোধে প্রভাব বিস্তার করে। পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও এ মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সারসংক্ষেপ

মূল্যবোধ, মনোভাব ও কর্মসন্তুষ্টি - এ তিনটি উপাদান কর্মীর কর্মসম্পাদনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন কতিপয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য বা মানবিক গুনাবলী যা তার আচরণের মান বা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। দুই ধরণের মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। একটি হচ্ছে টার্মিনাল মূল্যবোধ এবং অপরটি ইন্সট্রুমেন্টাল মূল্যবোধ। এছাড়া, সামাজিক জীব হিসেবে সাধারণভাবে সমাজ জীবনে মানুষ চার ধরণের মূল্যবোধের মুখোমুখি হয়। যথা-ব্যক্তিগত মূল্যবোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও পেশাগত মূল্যবোধ।

পাঠ ৪.২ মনোভাব
Attitudes

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মনোভাব সম্পর্কে ধারণা পারবেন।
- মনোভাবের উৎসগুলো বলতে পারবেন।
- মনোভাবের ধরণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- জ্ঞানীয় অসঙ্গতি তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা বা বস্তুর প্রতি যে অনুভূতি, বিশ্বাস ও আচরণ প্রকাশ করে তাকেই মনোভাব বলা হয়ে থাকে। মনোভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক দু'রকমেরই হতে পারে। ব্যক্তির মনোভাব তার পারিপার্শ্বিক পরিমন্ডল থেকে গড়ে ওঠে। সুতরাং, কোনো বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া প্রদান ব্যক্তির মনোভাবের উপর নির্ভরশীল নীরবতা বা কর্মের মাধ্যমে মনোভাব প্রকাশ করা যায়। তবে মতামত মনোভাবের বাচনিক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। স্টিফেন রবিনস (Stephen Robbins) এর মতে, কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা অবস্থার প্রতি কোন ব্যক্তির অনুকূল বা ইতিবাচক, প্রতিকূল বা নেতিবাচক মূল্যায়নমূলক বিবরণীকে মনোভাব বলে।

মনোভাব এবং মূল্যবোধ একই জিনিস নয়, কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। সাংগঠনিক আচরণে মূল্যবোধ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি মনোভাবও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, কোনো বস্তু বা ঘটনার প্রতি কর্মীদের অনুভূতি ও বিশ্বাস যা তাদের নির্দিষ্ট পরিবেশে নির্দিষ্ট কর্মসম্পাদনের বিষয়ে নির্দিষ্ট আচরণ করতে প্রভাবিত করে।

কোনো বস্তুর প্রতি তিনটি ভিন্ন ধর্মী কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল উপাদান দিয়ে মনোভাব গড়ে ওঠে ঃ

(ক) অনুভূতিমূলক উপাদান (Affective Component)ঃ কোন বস্তু, ঘটনা, বিষয় বা ধারণার প্রতি কোনো ব্যক্তির অনুভূতি, আবেগ, রসবোধ ইত্যাদি এবং ঐ বস্তু, ঘটনা বিষয় সম্পর্কে তার পছন্দ বা অপছন্দ করার প্রবণতা অনুভূতিমূলক উপাদানের অন্তর্ভূক্ত।

(খ) অবগতিমূলক উপাদান (Cognitive Component)ঃ ব্যক্তির বিশ্বাস, মতামত, জ্ঞান ও প্রাপ্ত তথ্য ইত্যাদি অবগতিমূলক উপাদানের অন্তর্ভূক্তি।

(গ) আচরণমূলক উপাদান (Behavioral Component)ঃ কোনো কিছু করার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিতে কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট পন্থায় আচরণের প্রবণতা আচরণমূলক উপাদানের অন্তর্ভূক্ত।

আলোচিত উপাদানগুলো ব্যক্তির মনোভাব গঠনে সমন্বিত প্রভাব বিস্তার করে। অনুভূতি, অবগতি এবং আচরণ প্রবণতার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বস্তু, ঘটনা, বিষয় সম্পর্কে আমাদের মনোভাব গঠিত হয়।

মনোভাবের উৎসসমূহ
Sources of Attitudes

মূল্যবোধের মতই মনোভাবও পিতা-মাতা, শিক্ষক, সঙ্গী এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। আমরা জন্মগতভাবেই পিতা-মাতা বা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে কিছু বৈশিষ্ট্যাবলী পেয়ে থাকি। আমরা শৈশব থেকেই যাদেরকে শ্রদ্ধা করি, যাদের প্রতি মুগ্ধ হই এমনকি ভীত হই, তাদেরকে অনুকরণ করার চেষ্টা করি। তখন থেকেই মূলতঃ আমাদের মনোভাব গঠন হতে থাকে। আমরা পর্যবেক্ষণ, কখনও বা মনোযোগী হই কিভাবে আমাদের পরিবার এবং বন্ধুরা আচরণ করে এবং আমরা নিজেদের মনোভাব ও আচরণকে তাদের সাথে সামঞ্জস্য করে থাকি। অনেকে আবার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বদের মনোভাবকে অনুকরণ করে থাকে। এছাড়াও আমরা যাদের প্রতি মুগ্ধ হই কিংবা শ্রদ্ধা করি, সেইসব

ব্যক্তিদের আচরণ ও মনোভাবকে আমরা অনুকরণ করে থাকি। তবে, মূল্যবোধের বিপরীতে মনোভাব কম স্থিতিশীল হয়।

সংগঠনে মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটা কর্মক্ষেত্রে আচরণকে প্রভাবিত করে। যেমন-কর্মীদের দিয়ে একই বেতনে কিংবা কম বেতনে বেশি সময় ধরে কাজ করানো, এখানে বোঝার বিষয় কিভাবে সুপারভাইজরের মধ্যে এ মনোভাবের জন্ম নিয়েছে, প্রকৃত কর্ম-আচরণের সাথে তার এ মনোভাবের সম্পর্ক এবং কিভাবে তার মনোভাবের পরিবর্তন ঘটতে পারে।

মনোভাবের ধরণ

Types of Attitudes

একজন মানুষের হাজার ধরণের মনোভাব থাকতে পারে, কিন্তু সাংগঠনিক আচরণে শুধুমাত্র কর্ম-সম্পর্কিত মনোভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। সাংগঠনিক আচরণের উপর পরিচালিত বেশিরভাগ গবেষণা তিন ধরণের মনোভাবের উপর গুরুত্বারোপ করেছেঃ

১. কর্মসন্তুষ্টি (Job Satisfaction)
২. কর্ম সম্পৃক্ততা (Job Involvement)
৩. সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি (Job Commitment)

এ তিনটি মনোভাব সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল ঃ

১. কর্মসন্তুষ্টিঃ সাধারণভাবে কর্মসন্তুষ্টি বলতে বুঝায় কোনো ব্যক্তির তার কার্যের প্রতি সাধারণ মনোভাব। যে ব্যক্তি তার কর্মের প্রতি যত বেশি সন্তুষ্ট সে তত বেশি ঐ কর্মের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব ধারণ করে। বিপরীত ভাবে, যে ব্যক্তি কর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট সে তার কর্মের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব ধারণ করে। যখন আমরা কর্মী মনোভাব নিয়ে কথা বলি তখন মূলত কর্মসন্তুষ্টির কথা বুঝাইনা। আসলে, সংগঠনে এ দু'টি শব্দ বারংবার একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু সাংগঠনিক আচরণের গবেষকরা কর্মসন্তুষ্টির উপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছেন, সেহেতু আমরা পরবর্তী পাঠে এ সম্পর্কে আরো বিশদভাবে আলোচনা করবো।

২. কর্ম সম্পৃক্ততাঃ সাংগঠনিক আচরণ শিক্ষায় কর্মে সম্পৃক্ততা একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। কর্মে সম্পৃক্ততার কোনো সর্বজনীন সংজ্ঞা নেই। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, কর্মে সম্পৃক্ততা হচ্ছে একজন ব্যক্তি মানসিকভাবে তার কর্মের সাথে কতখানি জড়িত তা পরিমাপ এবং পরিমাপকৃত মাত্রা অনুযায়ী ব্যক্তি তার কর্মক্ষমতা নির্ধারণ করে। যে ব্যক্তি নিজেকে কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিতে পারে সে স্বাভাবিকভাবেই ঐ নির্দিষ্ট কাজটি মন দিয়ে করতে পারে।

কর্মস্থলে অনুপস্থিতি এবং পদত্যাগের হার সরাসরি ভাবে কর্ম সম্পৃক্ততার সাথে জড়িত। যদি কর্মীরা তার কর্মের সাথে উচ্চমাত্রায় সম্পৃক্ত থাকে তাহলে অনুপস্থিতির হার যেমন কমে তেমনি ঐ কর্মস্থল ত্যাগ করার প্রবণতাও অনেকাংশে কমে আসে।

৩. সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতিঃ কর্মীদের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও তার লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয় এবং সেই প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সম্পৃক্ত করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এ মনোভাবকে সাংগঠনিক আচরণের ভাষায় সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি বলা হয়। সুতরাং, কর্মে সম্পৃক্ততা বলতে বুঝায়, কর্মীদের কর্মের প্রতি নিজেকে সম্পৃক্ত করার মনোভাব এবং সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি বলতে বুঝায়, নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সম্পৃক্ত করা। কর্মীর কর্মের প্রতি তার সম্পৃক্ততার মনোভাবের ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতি কোন ধরণের প্রতিশ্রুতি নাও থাকতে পারে। কিন্তু, সংগঠনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা মনোভাবের ক্ষেত্রে কর্মী যেমন কর্মের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে ঠিক তেমনি সংগঠনের প্রতিও সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

জ্ঞানীয় অসঙ্গতি তত্ত্ব

Cognitive Dissonance Theory

মার্কিন সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক লিওন ফেস্টিঙ্গার (Leon Festinger) পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে তাঁর বিখ্যাত জ্ঞানীয় অসঙ্গতি তত্ত্ব উত্থাপন করেন। এ তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি তার উপলব্ধির সাথে কিভাবে ও কেন দ্বন্দ্বে

জড়িয়ে পড়ে বা স্ববিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। মানুষ জেনে বা না জেনে একই সঙ্গে স্ববিরোধী ধারণা বা বিশ্বাস পোষণ করেন, যা তাদের অন্যায় আচরণের দিকে ঠেলে দেয়। এ পরিস্থিতিতে মানসিক স্বস্তির জন্য স্ববিরোধী চিন্তা বা বিশ্বাসের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো হয় বা তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। মূলত এ তত্ত্ব মানুষ কিভাবে তার অভ্যন্তরীন সংহতির জন্য সংগ্রাম করে তার উপর আলোকপাত করে।

সাধারণত ব্যক্তির মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দেয় যখন সে মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত বা দুর্বল হয়। এ সময় ব্যক্তির মনোভাব ও আচরণের মধ্যে তারতম্য দেখা দেয়। এ তত্ত্ব মনোভাব এবং আচরণের মধ্যকার সংযোগ স্থাপন কিভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। জ্ঞানীয় অসঙ্গতি বলতে যেকোনো অসঙ্গতিকে বোঝায়- যখন কোনো ব্যক্তি দুই বা ততোধিক মনোভাব কিংবা আচরণ এবং মনোভাব একই সাথে ধারণ করে। ফেস্টিঙ্গার যুক্তি দেন, যেকোনো ধরণের অসংগতি অস্বস্তিকর এবং ব্যক্তি তার মধ্যকার বিদ্যমান অস্বস্তি কমিয়ে আনার জন্য ঐ অসঙ্গতিগুলো কমিয়ে আনার চেষ্টা করে।

কোনো ব্যক্তিই সম্পূর্ণভাবে অসংগতিকে এড়িয়ে চলতে পারেনা। উদাহরনস্বরূপ, আপনি আপনার সন্তানকে খাবারের পর সবসময় দাঁতব্রাশ করার কথা বলছেন কিন্তু আপনি নিজে তা করেননা। এক্ষেত্রে আপনার মনোভাবে যেমন অসংগতি রয়েছে তেমনি আপনার মনোভাব ও আচরণ দু'টোই স্ববিরোধী। যে উপাদানগুলো আপনার মধ্যে অসংগতি তৈরি করছে সেগুলি যদি তুলনামূলকভাবে কমগুরুত্বপূর্ণ হয় তাহলে এই অসামঞ্জস্যতা দূর করার প্রয়াসও কম হয়। আবার, প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো যদি নিয়ন্ত্রণ অযোগ্য হয়, মনোভাব পরিবর্তনের খুব একটা আগ্রহ ব্যক্তির মধ্যে থাকেনা।

সারসংক্ষেপ

কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা বা বস্তুর প্রতি যে অনুভূতি, বিশ্বাস ও আচরণ প্রকাশ করে তাকেই মনোভাব বলা হয়ে থাকে। মনোভাব ইতিবাচক বা নেতিবাচক দু'রকমেরই হতে পারে। মনোভাব এবং মূল্যবোধ একই জিনিস নয়, কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। মূল্যবোধের মতই মনোভাবও পিতা-মাতা, শিক্ষক, সঙ্গী এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। সংগঠনে মনোভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ এটা কর্মক্ষেত্রে আচরণকে প্রভাবিত করে। সাংগঠনিক আচরণের উপর পরিচালিত বেশিরভাগ গবেষণা তিন ধরণের মনোভাবের উপর গুরুত্বরোপ করেছেঃ কর্মসন্তুষ্টি, কর্ম সম্পৃক্ততা এবং সাংগঠনিক প্রতিশ্রুতি। মানুষের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করার জন্য জ্ঞানীয় অসঙ্গতি তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একজন ব্যক্তি তার উপলব্ধির সাথে কিভাবে ও কেন দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে বা স্ববিরোধী মনোভাব পোষণ করেন।

পাঠ ৪.৩ কর্মসন্তুষ্টি
Job Satisfaction

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কর্মসন্তুষ্টি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- কর্মসন্তুষ্টির নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্মসম্পাদনে কর্মসন্তুষ্টির প্রভাব আলোচনা করতে পারবেন।
- কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপের উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণভাবে কাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতিকে কর্মসন্তুষ্টি বলে। এই অনুভূতি হচ্ছে কর্মীর মনোভাব। কর্মক্ষেত্রে কর্মীকে তার সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়, প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়, কর্মসম্পাদন মান বজায় রাখতে হয়, কার্য পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে তাকে সম্পৃক্ত থাকতে হয়। এ থেকে বুঝা যায়, কর্মী কর্মের প্রতি কতখানি সন্তুষ্ট তা নির্ধারণ করা খুবই জটিল একটি কাজ। এই জটিলতার মূল কারণ হচ্ছে-শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, মর্যাদা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বেতন ইত্যাদি তারতম্যহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির অনুভূতি ও ধারণার মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। বস্তুত সংগঠনের কার্যক্রম ও পরিবেশ, সংগঠনের নীতি ও প্রশাসন, প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি কর্মীদের যে অনুকূল ও প্রতিকূল ধারণা সৃষ্টি হয় তাকে কর্মসন্তুষ্টি বলে।

কর্মসন্তুষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিথ ডেভিস ও নিউস্টর্ম (Keith Davis & J.W.Newstorm) বলেছেন, "Job satisfaction is a set of favorable and unfavorable feeling with employees view their work." অতএব, কর্মসন্তুষ্টি হচ্ছে কর্মের প্রতি কর্মীদের অনুকূল ও প্রতিকূল ধারণা। এ প্রক্রিয়ার সাথে কর্মীর মনোভাব সরাসরি জড়িত। কর্মীদের মধ্যে অনুকূল মনোভাব তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানে রক্ষনাবেক্ষণমূলক উপাদানসমূহ, যেমন- ভাল কর্ম পরিবেশ, প্রতিষ্ঠানের নীতি, নিয়ম, তত্ত্বাবধায়ন ইত্যাদি যথাযথভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

কর্মসন্তুষ্টির নির্ধারকসমূহ
Determinants of Job Satisfaction

কর্মসন্তুষ্টি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হয়। এ ক্ষেত্রে কর্মীর মনোভাব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্মীর মনোভাবকে গুরুত্বে রেখে প্রতিষ্ঠানের দরকার রক্ষণাবেক্ষনমূলক উপাদানগুলোকে নিশ্চিত করা, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। কর্মসন্তুষ্টির নির্ধারকগুলো কর্মীর মনোভাবের সাথে সম্পর্কিত। নিম্নে নির্ধারকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলঃ

১. **কর্ম পরিবেশঃ** কর্মক্ষেত্রের নিয়ম-নীতি, পরিচ্ছন্নতা, প্রয়োজনীয় আলো-বাতাস, বিনোদন, প্রয়োজনীয়, উপকরণ, ইত্যাদির সমন্বয়ে কর্ম পরিবেশ গড়ে ওঠে। উন্নত কর্ম পরিবেশ কর্মীদের মধ্যে অধিক কর্মসন্তুষ্টি তৈরি করে।

২. **কাজের প্রকৃতিঃ** পূর্বের আলোচনাগুলো থেকে আমরা দেখেছি কর্মীর মনোভাব তার কর্মসন্তুষ্টির ক্ষেত্রে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং কাজের বিষয়বস্তু বা প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কর্মীর সন্তুষ্টি। কাজ যদি তার পছন্দের হয় তাহলে কর্মক্ষেত্রে সে সন্তুষ্ট থাকবে। শুধু তাই নয়, মর্যাদা সম্পন্ন কোনো কাজ যদি তা কষ্টসাধ্যও হয় সেক্ষেত্রে ঐ কাজ সম্পন্ন করতে কর্মী বেশি আগ্রহী থাকে যা তার মধ্যে কর্মসন্তুষ্টি তৈরি করে।

৩. **বেতন ও মজুরিঃ** বেতন ও মজুরি নীতি কর্মসন্তুষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সঠিক এবং ন্যায় বেতন ও মজুরি কাঠামো প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন কর্মীদেরকে কর্মক্ষেত্রে সন্তুষ্ট রাখতে সহায়তা করে।

৪. **চাকুরি নিরাপত্তাঃ** কর্মীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করার ক্ষেত্রে তাদের চাকুরির নিরাপত্তা প্রদান করা অধিক প্রয়োজন। চাকুরির নিরাপত্তা না থাকলে কর্মীদের মধ্যে কর্মঅসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়।

৫. **তত্ত্বাবধান ঃ** কর্মসন্তুষ্টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে তত্ত্বাবধান। তত্ত্বাবধায়ক অভিজ্ঞ, দক্ষ ও আন্তরিক হলে কর্মীরা স্বতস্ফুর্তভাবে তার অধীনে কাজ করতে আগ্রহী থাকে এবং তাদের মধ্যে সন্তুষ্টি বজায় থাকে।

৬. **দায়িত্বঃ** দায়িত্বপূর্ণ কাজের মাধ্যমে একজন কর্মী তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারে। এজন্য অধিকাংশ কর্মী দায়িত্বপূর্ণ কাজ গ্রহণে আগ্রহী হয় যা তার কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধিতে সহায়ক।

৭. **কর্মীদলঃ** সহকর্মী কিংবা কর্মীদল যাদের সাথে কর্মী কাজ করবে তারা সমজাতীয় এবং আন্তরিক হলে কর্মীর মধ্যে কর্ম চাঞ্চল্যতা ও কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়।

উপর্যুক্ত উপাদানগুলো ছাড়াও বয়স, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা, শিক্ষার স্তর, পেশার স্তর, ব্যক্তিগত পার্থক্য কর্মীদের কর্মসন্তুষ্টির ওপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক এ উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠানে নিশ্চিত করা।

কর্মীদের কর্মসম্পাদনে কর্মসন্তুষ্টির প্রভাব

The Effect of Job Satisfaction on Employee Performance

কর্মীদের কর্মসন্তুষ্টি সমগ্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও কর্মকান্ডকে প্রভাবিত করে। তবে, একজন সন্তুষ্ট কর্মী অধিক উৎপাদনক্ষম নাও হতে পারে। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, কম উৎপাদনক্ষম কর্মীকে বেশি কষ্টের কাজ করতে হয়না বলে সে তার কাজে সন্তুষ্ট থাকে।

কর্মীদের কর্মসম্পাদন ও কর্মসন্তুষ্টির মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল হলেও এদের মধ্যে একটি ইতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ, কর্মসন্তুষ্টি কর্মসম্পাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই প্রভাবিত হবার কারণ হচ্ছে- কর্মীরা তাদের কর্মসম্পাদনের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, উদ্দীপনা ও প্রেষণা পেয়ে থাকে। নিচে চিত্রের সাহায্যে কর্মীদের কর্মসম্পাদনে কর্মসন্তুষ্টির প্রভাব দেখানো হলোঃ

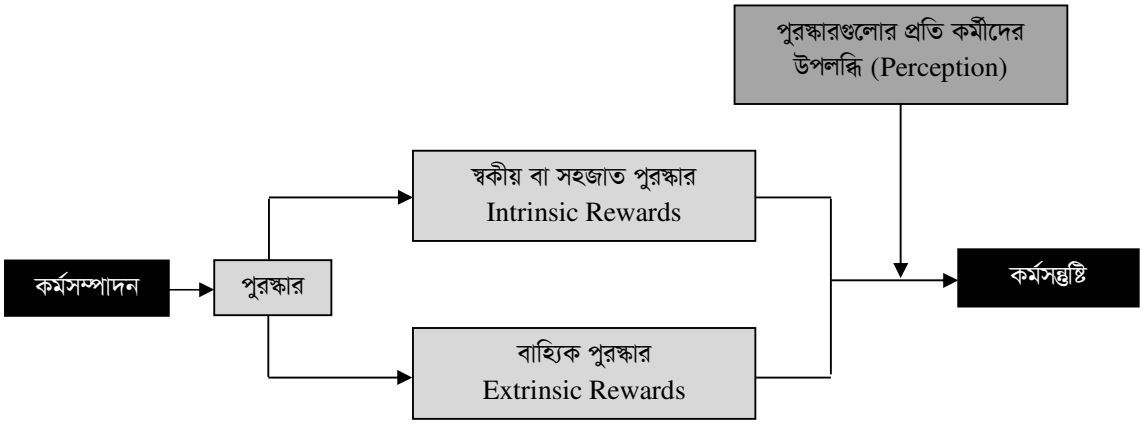

চিত্র: কর্মীদের কর্মসম্পাদনে কর্মসন্তুষ্টির প্রভাব

চিত্রটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কর্মীদের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে বা সময়ে তাদেরকে উদ্দীপিত করতে দু'ধরনের পুরস্কার দেওয়া হয়ঃ (ক) স্বকীয় বা সহজাত পুরস্কার এবং (খ) বাহ্যিক পুরস্কার। এ পুরস্কারগুলো উদ্দীপক হিসেবে কাজ করে। যখন কর্মীরা কর্মসম্পাদনে নিজ থেকে উদ্দীপিত হয় তাকে স্বকীয় বা সহজাত পুরস্কার বলে। যেমন নিজ দক্ষতার প্রতি গর্ববোধ, কৃতিত্বের যৌক্তিকতা, কর্মের স্বীকৃতি, কাজের স্বাধীনতা। স্বকীয় পুরস্কার যেহেতু অভ্যন্তরীন সেহেতু এগুলো দৃশ্যমান নয় কিন্তু কর্মীদের আবেগের সাথে সংযুক্ত। কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তাদেরকে বাহ্যিক

পুরস্কার দিতে হবে যাতে তারা ভালভাবে কর্মসম্পাদন করতে পারে। এ পুরস্কারের উৎস প্রতিষ্ঠান নিজে। যেমন- বেতন, বোনাস, কমিশন, পদোন্নতি, লভ্যাংশ ইত্যাদি। এ পুরস্কারগুলো একজন কর্মীকে প্রতিষ্ঠানে উত্তম কর্মসম্পাদনকারী ব্যক্তি (Best Performer) হিসেবে স্বীকৃতি দিবে। স্ট্যাসি এ্যাডামস (Stacy Adams) -এর ইকুইটি তত্ত্ব অনুযায়ী যদি কর্মস্থলে সঠিক সময়ে সঠিক পুরষ্কার (স্বকীয় এবং বাহ্যিক) পাওয়া যায় তবেই কর্মীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত হবে।

কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপ

Measuring Job Satisfaction

কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপ করা অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মধ্যে চারটি পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপকঃ

(ক) সিমেনটিক ডিফারেন্সিয়াল স্কেল (Semantic Differential Scale)
(খ) পোর্টার পদ্ধতি (Porter Method)
(গ) মুখভঙ্গি স্কেল (Faces Scale)
(ঘ) কর্ম বিবরণী সূচক (Job Description Index)

নিচে পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো ঃ

(ক) সিমেনটিক ডিফারেন্সিয়াল স্কেলঃ এ পদ্ধতিতে কর্ম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব জানার চেষ্টা করা হয়। প্রতিষ্ঠান জরিপের মাধ্যমে কর্মীদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করে। এ জরিপে কর্মসন্তুষ্টির উপর প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন উপাদানগুলোর ক্ষেত্রে কর্মীর দৃষ্টিভঙ্গি যাচাইয়ের মাধ্যমে কর্মসন্তুষ্টির পরিমাপ করা হয়।

(খ) পোর্টার পদ্ধতিঃ L.W. Porter কর্ম পদ্ধতি পরিমাপের ক্ষেত্রে কর্মীদের উপলব্ধিকৃত অবস্থার সাথে প্রকৃত অবস্থার কি সম্পর্ক রয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে নিচের প্রশ্নগুলোর সাহায্যে কোন কর্মীর কর্মসন্তুষ্টি সম্পর্কে জানা যায় ঃ

<u>আপনার চাকুরির নিরাপত্তা সম্পর্কে আপনার অনুভূতি</u>

(১) বর্তমানে আপনার চাকুরিতে কতটুকু নিরাপত্ত বিদ্যমান?

সর্বনিম্ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ **সর্বোচ্চ**

(২) আপনার চাকুরিতে কতটুকু নিরাপত্তা থাকা উচিৎ?

সর্বনিম্ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ **সর্বোচ্চ**

(৩) বর্তমানে বিদ্যমান চাকুরিতে নিরাপত্তা আপনার কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য?

সর্বনিম্ন ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ **সর্বোচ্চ**

এখানে ২নং প্রশ্নের উত্তর থেকে ১নং প্রশ্নের উত্তর বিয়োগ করে কর্মসন্তুষ্টি নির্ধারণ করা যায়। যদি ফলাফল কম হয় তাহলে কর্মসন্তুষ্টি উচ্চ হবে। ৩নং প্রশ্নের উত্তর থেকে চাকুরির নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা যায়।

(গ) মুখভঙ্গি স্কেলঃ সহজ এ কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপ করার পদ্ধতিতে কর্মীদের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না ইত্যাদি অভিব্যক্তিগুলো একাধিক মুখভঙ্গির ছবি কর্মীদের কাছে উপস্থাপন করা হয়। উপস্থাপিত মুখভঙ্গির ছবিগুলোতে

কর্মীদেরকে টিক দিতে বলা হয়। এ টিক দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংগঠনের কাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ।

(ঘ) কর্ম বিবরণী সূচকঃ এ পদ্ধতিতে কর্ম ও কর্মক্ষেত্রের বিভিন্ন উপাদানের উপর 'হ্যা' ও 'না' উত্তরের উপর ভিত্তি করে একটি সূচক তৈরি করে কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপ করা হয়। কর্মীর বেতন, পদোন্নতি, কর্মফল, তত্ত্বাবধায়ন, কর্মের বিভিন্ন শর্তাবলী, সহকর্মী ইত্যাদির ওপর কর্মীদের মতামত নেওয়া হয়। 'হ্যা', 'না' ও 'নীরব' এ তিনটির উপর ভিত্তি করে মতামতগুলো নেওয়া হয় । 'হ্যা' উত্তরের জন্য +১ পয়েন্ট, 'না' উত্তরের জন্য -১ পয়েন্ট ও 'নীরব' থাকার জন্য ০ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়। সূচকে পয়েন্ট যত বেশি হবে কর্মসন্তুষ্টির পরিমাণও তত বেশি হবে। এ পদ্ধতি সময় বাঁচানোর পাশাপাশি দ্রুত সময়ে ফলাফল পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে কাজের প্রতি প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অনুকূল বা প্রতিকূল অনুভূতিকে কর্মসন্তুষ্টি বলে। এ অনুভূতি হচ্ছে কর্মীর মনোভাব। কর্মীর মনোভাবকে গুরুত্বে রেখে প্রতিষ্ঠানের দরকার রক্ষণাবেক্ষনমূলক উপাদানগুলোকে নিশ্চিত করা। এ উপাদানগুলো কর্মসম্পাদনে উৎসাহিত করে এবং কর্মসন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে। কর্মসন্তুষ্টি পরিমাপ করা অসম্ভব কিছু নয়। বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হচ্ছে, যার মধ্যে চারটি পদ্ধতির ব্যবহার ব্যাপকঃ সিমেনটিক ডিফারেন্সিয়াল স্কেল, পোর্টার পদ্ধতি, মুখভঙ্গি স্কেল এবং কর্ম বিবরণী সূচক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

১. মূল্যবোধ কী? মূল্যবোধের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
২. আপনি কি মনে করেন আপনার মূল্যবোধের পিছনে আপনার পিতা-মাতার ভূমিকা রয়েছে? মূল্যবোধের উৎসগুলো কী? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৩. মিল্টন রকিচের মতে মূল্যবোধের ধরণ কয়টি? সমাজ জীবনে মানুষ কত প্রকার মূল্যবোধের মুখোমুখি হয়? ব্যাখ্যা করুন।
৪. ব্যক্তিগত মূল্যবোধ কি সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।
৫. "মনোভাব এবং মূল্যবোধ একই জিনিস নয়, কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পর্কিত" - আপনি কি একমত? মনোভাব ধারণাটি আলোচনা করুন।
৬. মনোভাবের উৎসগুলো আলোচনা করুন।
৭. সাংগঠনিক আচরণ বিজ্ঞানে কয় ধরণের মনোভাবের কথা বলা হয়েছে? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৮. জ্ঞানীয় অসঙ্গতি তত্ত্বটির প্রবক্তা কে? এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? বর্ণনা করুন।
৯. কর্মসন্তুষ্টি এবং কর্মসম্পাদন কি একে অপরের পরিপূরক? কর্মসন্তুষ্টির নির্ধারকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১০. কর্মীদের কর্মসম্পাদনে কর্মসন্তুষ্টির প্রভাবগুলো কী? চিত্র সহকারে বর্ণনা করুন।
১১. কর্মসন্তুষ্টি কি পরিমাপযোগ্য? বিস্তারিত আলোচনা করুন।